দৈনিক খবর

তারিখ 12 AUG 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষাংগনে সন্ত্রাসের কারণ ও তা প্রতিরোধের উপায়

● প্রিন্সিপাল এ কে এম শহীদুল্লাহ ●

বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে সবচেয়ে বেশী ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় হচ্ছে 'সন্ত্রাস'। বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অংগন থেকে স্কুল, কলেজ, খেলার মাঠ, পাড়া, মহল্লা, অলিতে-গলিতে, দোকানপাট, মিল-ফ্যাক্টরী, চায়ের দোকান, রাস্তার মোড়, বিয়ে বাড়ী এমনকি ধর্মীয় অনুষ্ঠানও সন্ত্রাসের কালো থাবা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। অর্থাৎ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়িয়ে পড়েছে সন্ত্রাস। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে অর্থাৎ বাংলাদেশের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অংগন থেকে শুরু করে সমগ্র দেশে (প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া) সতের হাজার স্কুল-কলেজ সমেত ৫০ লক্ষাধিক ছাত্র/ছাত্রী ও আড়াই লক্ষাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়ে আমাদের শিক্ষাংগন বিস্তৃত। যেহেতু শিক্ষাংগনের অবস্থান আমাদের সমাজের বাইরে নয় সেহেতু আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন দ্বীপ নয়। সুতরাং জনসংখ্যা সমস্যা, খাদ্য সমস্যা, বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ হাজারো সমস্যার সাথে সন্ত্রাসও একটি অতি প্রকট সমস্যা হিসেবে আজ আমাদের জাতীয় জীবনে আবির্ভূত হয়েছে। শুধু আবির্ভূত হয়েছে বললে বোধহয় ভুল হবে, বলা উচিত যে, সন্ত্রাস আমাদের সমাজে সর্বগ্রাসী জংগী রূপ নিয়ে রণ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।

হাজারো সমস্যার অতল তলে নিপতিত বাংলাদেশে সন্ত্রাসকে কত নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তা নিয়ে আমাদের মাঝে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু ঘাতক ব্যাধি এইডস-এর চেয়েও মারাত্মক ও সংক্রামক ব্যাধির মত সন্ত্রাস আজ আমাদের সমাজ কাঠামোকে তার বিষক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত কলুষিত করে চলেছে। এ বিষয়ে বোধহয় আমরা সকলেই একমত।

আমাদের সমাজে আজকের মুখ্য আলোচ্য বিষয় 'শিক্ষাংগনে সন্ত্রাস'। সমগ্র দেশের প্রায় ১২ কোটি মানুষের সকলেই কোন না কোনভাবে শিক্ষাংগনের সাথে জড়িত। প্রতিটি পরিবারেরই ছেলে-মেয়ে, আত্মীয়-স্বজন, ভাই- বোন বা কেউ না কেউ স্কুলে বা কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে এবং শিক্ষাংগন সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়ার কারণে পুরো দেশবাসী আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি বলা যায়।

শিক্ষাংগন হলো আমাদের আগত প্রজন্মের কৃতিত্বের বিকাশ ও মেধা পরিস্ফুটিত করার উপযুক্ত ক্ষেত্র। একটি ছোট শিশু যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পদার্পণ করে তখন তার মধ্যে ধারণ ক্ষমতা বা মেধা বিকাশের স্পৃহা বা সুযোগ বড় বেশী একটা থাকে না। ক্রমান্বয়ে সে যখন প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পেরিয়ে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্পণ করে তখন তার মেধা বিকাশের বা মুক্ত বুদ্ধি ধারণের ক্ষমতা বেড়ে যায়। তার এই উন্মুক্ত মন এবং ক্রমবর্ধমান চিন্তা-চেতনাকে কার্যতঃ দেশ ও জাতির কল্যাণে সফল রূপায়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ ও কলুষমুক্ত শিক্ষাংগন। সে জন্যই শিক্ষাংগনকে স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির বিকাশ, উন্নত নৈতিকতা এবং পরিচ্ছন্ন মূল্যবোধের লালন ক্ষেত্র হিসেবে আমরা সকলে দেখতে চাই। কিন্তু আজ আমাদের শিক্ষাংগন-এর দিকে তাকালেই দেখতে পাই সন্ত্রাসী কার্যকলাপে বিপর্যস্ত, বিপন্ন এবং কংকালসার এক রণক্ষেত্র।

বলতে গেলে প্রতিটি শিক্ষাংগন আজ Mini war field-এ পরিণত। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মূলতঃ সন্ত্রাসের কারণে গত আট বছরে সাড়ে চার বছর বন্ধ ছিল। ১৯৮৮ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ২৫৬ দিনই ক্লাস হয়নি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গত ৫ বছরে ৩ বছরই বন্ধ ছিল। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেশন জট বেড়েই চলেছে। তিন বছরের অনার্স কোর্স শেষ করতে লেগে যাচ্ছে ৫/৬ বছর। সন্ত্রাসের কারণে সমগ্র বাংলাদেশে ২শ'রও বেশী কলেজ আজও বন্ধ হয়ে আছে।

শিক্ষাংগনে কবে, কোথায় এবং কিভাবে সন্ত্রাসের প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলার উপায় নেই। আইউব-মোনেমের আমলে অর্থাৎ ৬০-এর দশকের প্রথমদিকে জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন বা এন এস এফ (N. S. F) নামে একটি বিশেষ ছাত্র সংগঠনের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের নমুনা আমরা প্রথম দেখতে পাই। হলের সীট দখল থেকে শুরু করে পাকিস্তানী শাসকদের শাসন ও শোষণকে পাকাপোক্ত করার কাজে এ সংগঠনটির সন্ত্রাসী ভূমিকা তখনকার সময়ের অনেকেরই স্মরণ থাকার কথা। তবে সে সময়ে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে হকিস্টিক, সাইকেল স্ট্যান্ড বা মশারী স্ট্যান্ড বা ছুরি-চাকুই বেশী প্রচলিত ছিল। স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার বড় বেশী একটা দেখা যায়নি।

স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রীয় আহবানে আমাদের তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের সিংহভাগ তাদের অস্ত্র সরকারের কাছে জমা দিলেও কিছুসংখ্যক বিপথগামী তরুণ তা নিজের কাছে রেখে দেয়। এ ধরনের অবৈধ অস্ত্রশস্ত্র বিভিন্নভাবে লুট, রাহাজানির কাজে ব্যবহারের পাশাপাশি শিক্ষাংগনে প্রবেশ করেনি- এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

কিন্তু এ কথা দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজস্ব দলের উদ্দেশ্য, প্রভাব-প্রতিপত্তি বর্ধিত বা অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে এক শ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল যুবককে দলে ভিড়িয়ে তাদের হাতে অস্ত্র সরবরাহই শিক্ষাংগনে সন্ত্রাসের অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

শিক্ষাংগনে রাজনৈতিক স্পন্দন বরাবরই প্রবল। কিন্তু বর্তমানে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রাজনীতিকে গ্রাস করেছে অস্ত্র। বই-পুস্তক-কলমের স্থান দখল করে নিয়েছে ঘাতক অস্ত্র। রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে সবুজ ক্যাম্পাস। সন্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতি ও অগ্রগতির মাধ্যমে সুখ-শান্তির আশার পরিবর্তে পিতা-মাতাকে দিনাতিপাত করতে হয় সীমাহীন আতংক এবং আশংকায়। না জানি তাদের সন্তান কখন লাশ হয়ে ফিরে আসে ঘরে। যে পিতা-মাতার সন্তান লাশ হয়ে ফিরে এসেছে তাদের কাছে কি জবাব আছে আমাদের?

কিন্তু সন্ত্রাসের সাথে দেশের অর্ধ কোটি ছাত্র/ছাত্রীর মধ্যে শতকরা একজন ছাত্র/ছাত্রীও সরাসরি জড়িত নয়। অথচ এই মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসীর হাতে জিম্মি হয়ে আছে সমগ্র শিক্ষাংগন তথা সমগ্র জাতি এবং এর ফলে সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা আজ মহাবিপর্যয়ের সম্মুখীন।

অথচ ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণআন্দোলন, ৭১-এর স্বাধীনতা আন্দোলনসহ সকল রাজনৈতিক আন্দোলন-এ ছাত্র সমাজই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসীর জন্য একদিকে যেমন লাখ লাখ ছাত্র/ছাত্রীর শিক্ষা জীবন অনিশ্চয়তার আবর্তে নিপতিত হচ্ছে অন্যদিকে মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এদেশের ছাত্র সমাজের ভাবমূর্তি দেশে এবং বিদেশে ক্ষুন্ন হচ্ছে।

সীমাহীন ও ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে বর্তমানে আমাদের শিক্ষাংগনে যে অরাজকতা এবং নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা যে কোন জাতির জন্য সর্বনাশের প্রান্তসীমা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে শুভ বুদ্ধির বিপরীতে পেশী শক্তি, দলীয় কোন্দল, রাজনৈতিক কলহ, দলাদলি ও অভাবনীয় হিংসাত্মক কার্যকলাপের মাধ্যমে মহল বিশেষের প্ররোচনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় একশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল যুবক আমাদের শিক্ষাংগণকে কলুষিত করে তুলছে। ছাত্রাবাসসমূহকে পরিণত করছে অস্ত্রাগারে। জ্ঞানার্জনের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পাদপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে অগণিত নিরীহ ছাত্র/ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তুলেছে।

রাজনৈতিক দিক থেকে এটা কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে, ছাত্র সমাজ আমাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য। সংকীর্ণ এবং দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য তাদের এ ব্যবহার যে জাতির ভবিষ্যতের জন্য কত ক্ষতিকর তা বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন।

ছাত্র সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ আজ মারামারি, অস্থিরতা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লিপ্ত। কিন্তু গোড়ায় যারা সুতা ধরে টানছেন বা কলকাঠি নাড়ছেন তারা আবার সমাজে নীতি বাক্যের কথা বলে সমাজ পরিবর্তনের বুলি আওড়াচ্ছেন। তাদের অনেকেই আবার নিজেরা অসৎ পথে থেকে সম্পদের পাহাড় গড়ছেন আর ছাত্রদের সৎ থাকতে উপদেশ দিচ্ছেন। তারা নিজেরা ভোগ করছেন, আর ছাত্রদের ত্যাগ স্বীকার করতে বলছেন। এভাবে তারা জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে ছাত্রদের দিয়ে স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধি করার প্রয়াস

শিক্ষাংগনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার লক্ষ্যে সমাজের বিদগ্ধ জন, পন্ডিত ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী তাদের মূল্যবান মতামত দিয়েছেন, সংবাদপত্রের পাতায় অসংখ্য প্রবন্ধ ছাপানো হয়েছে, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে বক্তারা সন্ত্রাস নির্মূলের আহবান জানিয়ে তাদের পান্ডিত্যপূর্ণ ও অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্য রেখেছেন। তবু দেশ যেন যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাস কারা করে, কারা তাদের মদদ যোগায়, এ সব আর এখন অজানা নয়। তবু সন্ত্রাসীরা থেকে যায় ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, নতুন সাজে, নতুন উৎসাহে তারা আবির্ভূত হয়। তাদের আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের বিকট শব্দে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে কলেজ প্রাংগন, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের পবিত্র অংগন। ঝরে পড়ে কোন তাজা প্রাণ, খবরের কাগজে সন্ত্রাসের খবর দখল করে নেয় শিরোনাম, শীর্ষস্থান। কিন্তু এ থেকে কি কোন মুক্তি নেই সমাজের সাধারণ মানুষের, লাখ লাখ ছাত্র/ছাত্রীর, যারা নির্বিঘ্নে লেখাপড়া করে আগামী দিনে একটি সুস্থ এবং সুন্দর জীবন গড়ার মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়নে হাল ধরতে চায়?

সন্ত্রাসের কবলে পড়ে অকালে প্রাণ দিচ্ছে শুধু যারা সন্ত্রাস করে তারাই নয়- নিরীহ মানুষ, পথচারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেধাবী ছাত্র কিংবা তরুণ সবাই। ছাত্র সংগঠনগুলো এমনকি ক্ষমতাসীন দলের অংগ সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অতি সম্প্রতি নির্বাচিত হয়েই শিক্ষাংগন থেকে সন্ত্রাস প্রতিরোধ তাদের অন্যতম ও প্রধান কর্মসূচী হিসেবে ঘোষণা করেছে। রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা তাদের বক্তব্যে শিক্ষাংগনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন কিন্তু কিছুতেই যেন কোন ফল হচ্ছে না।

এই না হওয়ার মূলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিয়ার ভাষায়, 'কিছু লোকের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব'। তাঁর মতেঃ 'ক্যাম্পাসে সংঘটিত সব বিয়োগান্ত নাটকের কুশীলবরা বাইরের জগতের বাসিন্দা। দূরে বসে এরা সূতোয় টানছেন' - সে টানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ হয় উত্তপ্ত ও সংঘাতমুখর। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্রের ব্যবহারের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে অনেকটা পরিষ্কার হবে। সাধারণভাবে ছাত্রদের হাতে খাতা-কলম- পেন্সিল শোভা পাওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বেশ কিছু ছাত্রের হাতে বই নেই। আছে কোমরে-পিঠে-হাতে পিস্তল, কিরিচ, কাটা রাইফেল। এসব অস্ত্রের কোন কোনটির দাম ২০ থেকে ৫০ হাজার টাকা, আবার কোনটি দুর্লভ। কোন মা-বাবা কিংবা ভাই বিশ, পঁচিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকার অস্ত্র কিনে দিতে পারেন না মারামারির জন্য। তাহলে এ অস্ত্রের যোগান কারা দেয় এবং কি উদ্দেশ্যে দেয় এটা বুঝতে কারো কষ্ট [হয় না।] রাজনৈতিক নেতা-নেত্রী কি

আজকের কাগজ

তারিখ 12 AUG 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ক্ষমতাসীন বা বিরোধী দলীয় সকলেরই কথায় এবং বিবৃতিতে মনে হয় তারা সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে কারো চাইতে কম আন্তরিক নন। কেউ বলছেন সন্ত্রাস আর শিক্ষা একসাথে চলতে পারে না। জাতীয় স্বার্থেই শিক্ষাংগনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। সন্ত্রাস প্রতিরোধে দল-মত নির্বিশেষে সকলে এগিয়ে আসুন ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে ঘটছে তার উল্টো। কোন রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠনের ছাত্রনেতা নামধারী সন্ত্রাসী মারা গেলে দেখা যায় সেই দলের নেতা বা নেত্রী মৃত সন্ত্রাসীর বাড়ীতে গিয়ে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছেন, পত্র-পত্রিকায় দায়ী ও দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবী করছেন। এমনকি মৃত সন্ত্রাসীকে 'শহীদ' উপাধিতে ভূষিত করছেন। কিন্তু দেশের স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র পানিতে ডুবে বা সড়ক দুর্ঘটনায় বা অন্য কোন উপায়ে মর্মান্তিকভাবে নিহত হলে তাদের বাড়ীতে যাওয়াতো দূরের কথা, দায়সারা গোছের বিবৃতি পর্যন্ত দেয়ার প্রয়োজন মনে করেন না জাতীয় নেতা-নেত্রীরা। এই তো সেদিন মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এসএসসিতে প্রথম, এইচএসসিতে ৬ষ্ঠ এবং কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যয়নরত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মাসুদুর রহমান 'শুভ্র'-এর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর কোন রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীকে এমনকি শিক্ষামন্ত্রী পর্যন্ত তার বাড়ীতে যাওয়াতো দূরের কথা, পত্রিকায় একটা দায়সারা গোছের বিবৃতিও দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি তাঁরা। এ থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, স্ব স্ব দলের কর্মী বা সদস্য ছাড়া অন্য সব সাধারণ এমনকি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছাত্রের জীবন-মৃত্যু তাঁদের কাছে গৌন? এ থেকে কি তাদের আসল রূপ ও দলীয় স্বার্থে সন্ত্রাসীদের লালনের প্রমাণ পাওয়া যায় না?

সন্ত্রাস যে শুধু উচ্চ পর্যায়ে পাঠরত ছাত্র/ছাত্রীদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে তা নয়; কিছু দিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'দল ছাত্রের মধ্যে গোলাগুলীর সময় ক্রস ফায়ারে আহত হয় উদয়ন ও ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরী স্কুলের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর অবুঝ ৪/৫টি ছেলে/মেয়ে। কয়েক মাস পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় একই স্থানে দিনে-দুপুরে দু'দল সন্ত্রাসীর ক্রস ফায়ারের সময় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণকে হ্যান্ড মাইকে বলতে শোনা গেছে- 'ছাত্র ভাইয়েরা, আপনারা কিছুক্ষণের জন্য গোলাগুলী বন্ধ করুন, উদয়ন স্কুল ছুটি হয়েছে, ছাত্র/ছাত্রীদেরকে বাড়ী যেতে দিন।' সন্ত্রাস দমনে সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণের যদি মহানগরী ঢাকায় দিনে দুপুরে এই অসহায় অবস্থা হয় তবে সারা দেশের সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কি?

অবশ্য শিক্ষাংগনে সন্ত্রাসের জন্য একশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররাই এককভাবে দায়ী, এ কথাও সম্পূর্ণ সঠিক নয়। এ কথা অপ্রিয় হলেও বলতে হয় যে, আমাদের শিক্ষকদেরও সকলে শিক্ষাদানে সমান আগ্রহী ও আন্তরিক নন। একটি অংশ দলাদলি ও রাজনীতিতে ব্যস্ত। তাঁদের প্রধান কাজ যেন সমর্থিত নিজস্ব দল বা রাজনৈতিক দলের স্বার্থ রক্ষা করা। শিক্ষকগণ যদি বেপরোয়া এবং সন্ত্রাসী ছাত্রদেরকে কারো বা কোন দলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে বলেন তবে তা কত সহজে চরম আকার ধারণ করতে পারে অতি সহজেই তা অনুমেয়।

এ প্রসংগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ সামসুল হক বলেন, 'কতিপয় শিক্ষকের রাজনীতির কারণে শিক্ষাংগনে সন্ত্রাস উৎসাহ পাচ্ছে'। এমনও দেখা গেছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এমনকি স্কুল-কলেজের কোন কোন শিক্ষক বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বা ছাত্র বিষয়ক উপদেষ্টা। এ অবস্থায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা শিক্ষকদের পক্ষে সব দল-মতের উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষভাবে সন্ত্রাস তথা শিক্ষাংগনের সমস্যা মোকাবিলা কতটুকু বাস্তবসম্মত তা অবশ্যই আমাদের আজ ভাবতে হবে।

শিক্ষকদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হওয়ার প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি একশ্রেণীর ছাত্র কর্তৃক পরীক্ষা না দিয়ে বছরের পর বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে থেকে ছাত্র রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকারের দাবীর কারণে শিক্ষাংগনে বিশেষ করে কলেজগুলোতে ছাত্র সংসদ বা সংগঠনের সাথে কলেজ কর্তৃপক্ষের সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটছে। অনেক ক্ষেত্রে তা ভয়াবহ সংঘর্ষের আকার ধারণ করেছে। এ ক্ষেত্রে একজন ছাত্র কতদিন বা কত বছর ছাত্র সংসদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে তার কোন সুনির্দিষ্ট বিধি বা নীতিমালা না থাকার কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। অনেকাংশে অপর্যাপ্ত বা অপূর্ণাংগ হলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি বা ম্যানেজিং কমিটি শিক্ষকদের কর্মকান্ড ও সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে চাকরি বিধি ও বেতন স্কেল এবং পরীক্ষা পরিচালনার ব্যাপারে পরীক্ষা অপরাধ আইন (Examination offence Act.) রয়েছে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রীদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ছাত্র সংসদগুলোর ভূমিকা ও কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা বা নিয়ম বিধির অভাবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন রূপে এবং নিয়মে ছাত্র সংসদ পরিচালিত হওয়ায় অনাবশ্যক প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত শিক্ষা বছরে অনিয়মিত ছাত্রদের ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে অনুমতি না দেয়ার ফলে ব্যাপক সন্ত্রাসের সূত্রপাত ঘটে, উপাচার্যের বাসভবন ভাঙচুর হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে অনড় থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত গত শিক্ষা বছরে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিতই হয়নি। এবারের ডাকসু নির্বাচনে কি হবে তা এখনও নিশ্চিত করে বলা যায় না। শিক্ষাংগনকে সন্ত্রাসমুক্ত করার লক্ষ্যে পরীক্ষা অপরাধ আইনের অনুরূপ শিক্ষাংগন সন্ত্রাস বা শিক্ষাংগন অপরাধ আইন (Campus Violence Prevention or Campus offecnce prevention Act) জারি করা অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি।